

Vol. 26 | No. 1 | 1982

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

তরঙ্গভঙ্গ : একটি অভিব্যক্তিবাদী নাটক

Volume	26
Issue	1
Year	1982
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	বেগম আকতার কামাল
Published online	December 1, 1982
DOI	10.62328/sp.v26i1.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v26i1.3
Pages	36-43
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

তরঙ্গভঙ্গ : একটি অভিব্যক্তিবাদী নাটক

বেগম আকতার কামাল

'বহিপীর' থিমেটিক দিক থেকে বাংলা নাটকের প্রচলিত বিষয়-ভাবনার অনুগামী। কিন্তু তবুও পার্থক্য সূচিত হলো। 'লালসালু'-তে যেমন দেখা গেল প্রথানুগ বিষয়ের প্রকাশ সত্ত্বেও অন্যতর ভঙ্গি, তেমনি 'বহিপীরে'র মধ্যেও সেই ধরনের ভিন্ন মেজাজ শিকড় গেড়ে নিল। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র শিল্পসাধনা ও চেতনার স্বকীয়তা প্রথম থেকে তার পথ করে নিচ্ছিল।

''তরঙ্গভঙ্গ''[১] প্রকাশের মধ্য দিয়ে সেই স্বতন্ত্র নাট্যচেতনা আত্মপ্রতিষ্ঠ হলো। সমসাময়িক উপন্যাস ''চাঁদের অমাবস্যা''র মতো ঐ নাটকটি দেশজ পটভূমি সংলগ্ন হয়েও চিন্তার কাঠামো ও প্রকরণশৈলীতে রীতিমত অগ্রবর্তী। ষাট দশকে যে ধারা বাংলা নাটকে বইছিল, তা থেকে বহু দূরবর্তী। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ নাটক ও উপন্যাস—উভয়ক্ষেত্রে এ সময় অভিন্ন একটি শিল্পরীতির চর্চায় মগ্ন ছিলেন। বোধকরি বিষয়-ভাবনার ক্ষেত্রে ঐক্যবোধ ছিল বলেই একই চিন্তার আবর্তন দুইটি মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে। কোন শিল্পী যখন বিশেষভাবে শিল্পাদর্শগত কোন রীতির পক্ষপাত মেনে নেন-তখন ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমে তার প্রকাশ পথ করে নিলেও ঐ আদর্শই মৌল চারিত্র্যে পর্যবসিত হয়। বিষয়ের ভিন্নতা সত্ত্বেও তাই সেখানে অভিন্ন রীতির স্বপ্রতিষ্ঠ বিকাশ লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। ঐ রকম একটি রীতির বন্ধনে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যচর্চা ক্রমশঃ বাঁধা পড়ছিল। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং বিভিন্নতা সত্ত্বেও রীতি ও প্রকরণকলার এই বশ্যতা তিনি কেন স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

স্বসমাজ সম্পর্কে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র চিন্তা অনেক বেশী সচেতন, ঋজু ছিল। এ প্রসঙ্গে তাঁর ভাষ্য—''মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে আমরা কেউ হয়ত অজ্ঞ নই, কিন্তু অধঃপতনের এই যে একটা চূড়ান্ত অবস্থা—এই অবস্থা নিয়ে লিখে আমার লেখা কলঙ্কিত (!) করতে চাই। ...আমার আঁকা ছবিতে সে সমাজকে প্রতিফলিত করতে চাই, যাতে তাতে তারা নিজের সুষ্ঠু চেহারা দেখবার সুযোগ পায়।''[২] বোঝা যাচ্ছে সৈয়দ ওয়ালী-উল্লাহ্-র বিষয়-সম্পর্কিত চেতনা স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট-বস্তুনির্ভর এবং আয়তনবিশিষ্ট। একটি বাস্তব সমাজের অবস্থাকে ফুটিয়ে তোলাই তাঁর লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু এই বিষয়মনস্ক চৈতন্য প্রচলিত ধারার হাত এড়িয়ে এমন একটি রূপরীতির সন্ধানে নিমগ্ন হয়েছে, যাতে বিষয়ের স্থাপত্য গেছে বদলে, ভঙ্গি হয়েছে পরিবর্তিত। আমাদের ষাটদশকের বাংলা নাটকের ফর্মে সংযোগ ঘটিয়েছে আন্তর্জাতিক আবহের। স্বদেশ থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব নিয়ে প্রবাসে অবস্থান করছিলেন বলেই শুধু নয়, তিনি য়ুরোপীয় শিল্পাদর্শের আবহাওয়ায় নিজের চেতনাকে পরিশ্রুত করে নিচ্ছিলেন। য়ুরোপীয় ভাবনায় দেশজ বস্তুসমাজকে জারিত করে নিয়েছিলেন, বা বলা চলে সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে যাচাই করে নিয়েছেন স্বসমাজকে, স্বসমাজের অবক্ষয়ী রূপকে। ফলে রীতির

বন্ধন না মেনে তাঁর উপায় ছিলনা। 'তরঙ্গভঙ্গে'র বিষয়বস্তু দেশজ হয়েও এর চিন্তার যে ফর্ম তা দেশজ নয়। একথা তাঁর উপন্যাস সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

নাটকটির বাইরের যে প্রতিকৃতি, তা আমাদের অতিচেনা, প্রতিনিয়ত আমাদের চার-পাশে এ ঘটনা ঘটছে। যে সামাজিক কাঠামোর মধ্যে আমাদের বসবাস, সেখানে এরকম ঘটনা একটা ক্রিয়া নয়, প্রতিক্রিয়ামাত্র। আমেনা নামে এক গ্রাম্যযুবতী হত্যা করেছে তার শিশুসন্তান ও স্বামীকে। এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী আবদুস সাত্তার নেওলাপুরী—সামাজিক দিক থেকে প্রবল প্রতিপত্তিশালী, অভিযোগ দায়ের করেছে আদালতে, সুবিজ্ঞ, সুবিচারক জজ সাহেব এই হত্যাকাণ্ডের বিচার করতে উদ্যত। এইটি বাইরের ঘটনা ঘটল। কিন্তু অন্তর্ঘটনা কি? কেন এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হল, সেই কারণের উদ্‌ঘাটন করেন নাট্যকার একটি স্বপ্নদৃশ্যের সংযোজন করে। নাটকের পাত্রপাত্রীকে পরিবর্তিত করে তাদের অন্তর্চেহারার উন্মোচন ঘটান।

এক সন্ধ্যায় পুকুরের ধারে হাওয়া খেতে গিয়ে কোন এক অলৌকিক বিদ্যুৎ ঝল-কানিতে জজসাহেব বিবেকদর্শন করেন এবং পরিবর্তিত হন। 'সেইদিন থেকে জজসাহেব আর জজসাহেব নেই, সমাজের ভারসাম্য রক্ষার জন্য, অন্যায় অপরাধের শাস্তি প্রদানের জন্য যাকে দণ্ডমুণ্ডের কর্তারূপে খাড়া করা হয়েছে; সেই তিনি তখন বুঝতে পারেন "দোষীকে কখনই তিনি ধরতে পারেননি। বরং তার হাতে বিচারককে হার মানতে হয় বারবার।"[৩] তখন বুঝতে পারেন প্রচল-সমাজ-প্রথা ও আইনকানুনের দুর্ভেদ্য দুর্গে তিনি বন্দী। এই বন্দীচেতনার অস্তিত্ব ও তার পরাজয়ই এ নাটকের প্রতিপাদ্য। অর্থাৎ সাঁত্রে-মুখী অস্তিত্ববাদকে ব্যক্তকরবার চেষ্টা করা হয়েছে। সেজন্য দেখি আত্মতদন্ত, আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মবিশ্লেষণই এখানে মুখ্য, কোনরকম সক্রিয় সংঘাত বা কার্যকারণঋদ্ধ আচরণ নয়। বিচারকের ভেতর-অভিমুখে যাত্রা যতোটা দার্শনিক, ততোটা বাস্তব প্রতীতি-গ্রাহ্য নয়। দায়িত্ববোধ এবং অস্তিত্বের বন্দীত্ব জজের প্রতীকে উন্মোচিত হলেও হঠাৎ কেন জজসাহেব শ্রেণীবদল করে আইনকানুনের শক্তকেল্লায় বসে প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করেন তা বোঝা যায় না। তবে সচেতন জজসাহেবের আত্মোপলব্ধির যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া এখানে আরও বিরাজ করছে আদিম অন্ধকার, ভীতি, একাকিত্ব, হিংস্রতা, ভয়াবহ ক্রোধ ও সর্বনাশ। নাটকে ঘটনা যা ঘটেছে, সবই এই সমস্ত ভাবনার নির্যাসকে ফুটিয়ে তুলেছে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসে ব্যক্তিচরিত্রের যে অবস্থান ও স্বরূপ চিত্রিত, যা নিয়ে তাঁর সামাজিক দায়িত্ববোধের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, সেটা নাটকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বিশেষতঃ নাটকে বস্তুবোধ ও চরিত্রের কাঠামো শূন্য বা অবয়বহীন হতে পারে না। দৃশ্যগ্রাহ্য সত্যতার দাবী এখানে অনেক বেশী। 'চাঁদের অমাবস্যা'য় আরেফ আলী মাস্টারের চেতনার স্রোত যা বহন করেছে, 'তরঙ্গভঙ্গে' সেই স্রোত প্রবহমান থাকতে পারেনি, এখানে বিভিন্ন চরিত্রের ঘাত প্রতিঘাত সে স্রোতকে ভেঙে দিয়েছে। তবুও তাঁর নাটকের ব্যক্তি অস্তিত্বপীড়িত সেই ব্যক্তি; যে পরিপার্শ্ব ও কার্যকারণ এড়িয়ে অস্তিত্ববাদী দায়িত্ববোধে আক্রান্ত এবং নিঃসঙ্গতার গ্রস্ত। এবং পরিণামে ঐ পরিবেশের কাছে ব্যর্থ ও পরাজিত, ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা নিঃসঙ্গ এবং সমাজসত্তা নিষ্ক্রিয় অথবা অনুদ্‌ঘাটিত। অথবা বলা চলে এখানে সমাজসত্তার বাইরে ব্যক্তিসত্তাকে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে। জজ হঠাৎ কেন পরিবর্তিত হন তা' স্পষ্ট নয়। আবার এই পরিবর্তন কতোটা বাস্তবসম্মত, কতোটা কার্যকারণসম্পৃক্ত তাও নাটকে পরিস্ফুট হয়নি। তবে উপন্যাসের চেয়ে বিশেষতঃ 'চাঁদের অমাবস্যা'র তুলনায় 'তরঙ্গভঙ্গে' সমাজবক্তব্য অনেকখানি মূল-সমস্যার কাছাকাছি পৌঁছেছে, 'তরঙ্গভঙ্গে'র জীবন আমাদের দৈনন্দিন বাস্তবতায় শর্তবন্দী।

নাট্যকারের সমস্যা-অবহিত তীক্ষ্ণদর্শী জীবনসন্ধানও এখানে অনেক বেশী প্রকাশিত। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, এমন একটি বস্তুনির্ভর কাহিনীর পরিণতি ও বিধৃত রীতি সম্পর্কে। যদিও মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, নাট্যকার সমাজবক্তব্যে স্থিতধী; কোন আধিদৈবিক সত্য-উচ্চারণ বা কোন শাশ্বতের প্রতিভাস কিংবা অনন্তের কণাভিক্ষা তাঁর অন্বিষ্ট নয়। সমস্যার মূলে যেমন পৌঁছেছেন, তেমনি সেই সমস্যার জটগুলো চিহ্নিত করেছেন।

কিন্তু কি সেই সমস্যা এবং কি তাঁর বক্তব্য! সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ এখানে inner-reality—বস্তুর অন্তর্সত্তাকে আবিষ্কারে উৎসাহী। ফ্রয়েডের স্বপ্ন ও কল্পনার (dream and fantasy) ব্যাখ্যানে যে inner-reality ব্যক্ত করবার প্রয়াস চলেছিল; সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সাঁত্রে-প্রভাবিত অস্তিত্ববাদ। মোটামুটি এই হচ্ছে 'তরঙ্গভঙ্গে'র চিন্তা-প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে নাটকটিকে অভিব্যক্তিবাদী (expressionistic) নাটক বলে আখ্যায়িত করা চলে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় অভিব্যক্তিবাদী বা প্রকাশবাদী রীতির উন্মেষ ঘটে এক যুদ্ধবিধ্বস্ত ভগ্নজাতির মানসিক অসাম্যের গর্ভ থেকে। বস্তুতঃ জার্মানীতে এই রীতির জন্ম ও চর্চা—যদিও এর সময়কাল খুব সংক্ষিপ্ত, প্রাধান্য লাভ করেছিল। এর পেছনের প্ররোচনা ছিল এক যুদ্ধবিরোধী চেতনা, ক্রমান্বয়ে যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রচলিত সমাজপ্রথা এবং অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও আক্রমণ। এর ফলে অভিব্যক্তি-বাদীরা কিছুটা বহির্মুখ ভূমিকা পালন করতে থাকে। বিশেষ করে যুদ্ধবিধ্বস্ত অনুভূতিতে তারা লালন করে এক ধরনের সমাজবাদী চিন্তা। একটা বক্তব্যও তারা পোষণ করত, কারণ অভিব্যক্তিবাদীরা ব্যক্তিগতভাবে আদর্শ জীবনের সূচনা করতে চেয়েছিল। ফলে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার পরিবর্তে অন্তর্গত উপলব্ধি অবলম্বন করলেন তারা, বস্তুকে বস্তুরূপে না দেখে শিল্পীর নিজের ভাবানুভূতি দিয়ে তাকে রঞ্জিত করে নিল। মানুষ যে প্রতিদিনের কর্মব্যবস্থায় পরাজিত ও দোষী সাব্যস্ত হচ্ছে, সেইটির তাৎপর্য ও মানবজীবনের বাস্তব অধিষ্ঠানের অন্তর্নিহিত সূত্র নির্ণয়ের চেষ্টা চলল। যা কিছু দৃষ্টি-গ্রাহ্য অথবা যা স্বতঃসিদ্ধ সেসব সত্যকে এড়িয়ে তারা মানুষের অন্তর্সত্তাকে যা প্রতি-নিয়ত আলোড়িত করছে, যেমন পাপবোধ অথবা পরাজয় তার মধ্য দিয়ে অগ্রসরমান মানুষের যে জীবিত চেতনা, সেই চেতনার তাৎপর্যকে তারা অভিব্যক্ত করতে চাইল। অর্থাৎ শেষাবধি অস্তিত্বের নিরীক্ষাই এদের মৌলিক চিন্তায় পর্যবসিত হল। সমাজবাদ ও যুদ্ধবিরোধী বোধ সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক বস্তুবোধের অভাবে তারা ভাববাদী আদর্শবোধে তাদের পরিণতিকে টেনে নিয়ে গেল। দুর্দশাগ্রস্ত এবং আতঙ্কজনক অস্তিত্বের এক অতিশয়িত রূপ ফুটিয়ে অন্তর্সত্তার সংকটই কেবলমাত্র তারা অনুধাবন করতে পারল।

আমেনা এখানে হত্যাপরাধে অভিযুক্ত। এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে যে প্ররোচনা সক্রিয়; নাট্যকার তার দীর্ঘ বর্ণনা করেন। যে বর্ণনা অস্তিত্বের সংকটকে ঊর্ধ্বচারী দৃষ্টিতে অব-লোকনের বর্ণনায় পর্যবসিত হয়েছে। আমেনা যখন একদিন জন্মেছিল তখন সে ছিল মুক্ত, "চতুর্দিকে আলো, আলো, কেবল আলোর সমারোহ। আলোউদ্ভাসিত পৃথিবী সোনালী কিরণের অন্তহীন নৃত্য। কুমুদের উপর টলমল করা পানির ফোঁটায় স্ফটিক-প্রভা। চোখ কেবল ঝলসে যায়। কিন্তু আলোর বিস্ময় ক্ষণস্থায়ী। ... তারপর দেখতে না দেখতে আলোর প্রতি তার ঘৃণা জন্মায়। ক্রমশ প্রতি সূর্যোদয়ে প্রতি বসন্তের অপরূপ পুষ্পসম্ভার; আলোকিত প্রতিমুহূর্তকে সে ঘৃণা করতে শুরু করে। একদিন তার মনে হয় সে ঘৃণা বহির্মুখী না হয়ে অন্তর্মুখী হয়েছে। চূড়ান্ত ঘৃণার মুক্তি-পথ যেন আদিম অন্ধকারের মধ্যেই, অন্তরের গহ্বরেই যেন তার সমাপ্তি। আমেনাকে ফাঁসিতে চড়াবার জন্য আজ এত সাজসরঞ্জাম, এত হুলুস্থুল। কিন্তু সে আওয়াজ তার

কানে পৌঁছায় না। যে-অন্ধকারে দূরতম তারারও আভাস নেই, যেখানে সৃষ্টির প্রাচীনতম শব্দও পৌঁছায় না, ইতিমধ্যেই সেখানেই ফিরে গিয়েছে আমেনা।"[৪]

আলোক পিপাসু মনে ক্রমে ঘৃণা জন্মায় এবং সে ঘৃণা বহির্মুখী না হয়ে অন্তর্মুখী হয়। কেন হয়? চারপাশের বিরুদ্ধতা যখন সেই মনকে পিষ্ট করে ফেলে। সে কার্যকারণ আমরা জানি। সমাজারোপিত বন্দীত্ব থেকে আমেনা আপন সন্তান ও স্বামীকে হত্যার মধ্য দিয়ে স্বীয় অস্তিত্বকে মুক্ত করে---যে মুক্ত অস্তিত্ব নিয়ে সে একদিন জন্মেছিল। অস্তিত্বের মুক্তি সংঘটনের এটাই কি পথ? বহির্মুখী ঘৃণার অন্তর্মুখে অভিযাত্রা কেন—যে কারণে সে আপন অস্তিত্বকেই প্রকৃতপক্ষে হত্যা করেছে! আমেনার সমাজসত্তা বহির্বিশ্বে নির্যাতিত, তার জীবন অর্থহীন কিন্তু তার ব্যক্তিসত্তা কি এখানে জয়ী হতে পেরেছে! সে সন্তান স্বামীকে হত্যা করেছে নিরুপায় হয়ে, তাকে সমাজ যখন শাস্তি দিতে উদ্যত, আমেনা সে শাস্তির উর্ধ্বে নির্বিকার মগ্নতায় স্বীয় অস্তিত্বকে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। সমাজের আইন তার ব্যক্তিসত্তাকে স্পর্শও করতে পারে না। কিন্তু জয়ের পথ তা নয়।

উত্তেজিত জনতার ক্রোধ তাকেও হত্যা করল। বিবেকের প্রতীক জজও দায়িত্ব-বোধের পরিচয় দিতে গিয়ে ফাঁসীর রজ্জু ব্যতীত দ্বিতীয় পন্থা খুঁজে পাননি। নিঃসঙ্গ ব্যক্তিসত্তার এই পরাজয় নাটকে খুব বেশী স্পষ্ট ও তির্যক—"আহা, একাকী প্রান্তর অতিক্রম করতে চেয়েছিলো, দড়ির বন্ধনে সে-যাত্রার অবসান ঘটেছে।"[৫]

আর জয়ী হয়েও প্রতিপক্ষ আবদুস সাত্তার নেওলাপুরী ভীত, "নিঃসন্দেহে আমারই জয় হয়েছে, কিন্তু এ-জয়ে কোন তৃপ্তি পাচ্ছি না যেন। (ইতঃস্তত করে, গলা একটু নামিয়ে, দৃষ্টি নত করে) এই জয়ের ফল যেন ভীতি। ভীতি! কী অত্যাশ্চর্য পুরস্কার।"[৬]

চরিত্রের অভ্যন্তরে বিরাজমান ভীতি, ক্রোধ, আদিমক্ষুধা--ইত্যকার মৌল প্রবৃত্তি-গুলোর উন্মোচন ঘটিয়েছেন নাট্যকার। অভিব্যক্তিবাদীরাও চেয়েছিল বস্তুজগৎকে পরি-বর্তিত না করে অন্তর্সত্তার প্রকাশ ঘটাতে, কারণ পরিবর্তনের যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা তাদের কাম্য নয়। ফলে আপাতঃ সমাজবক্তব্য বিধৃত হলেও তাদের লক্ষ্য হল দূরতর। আরও অভ্যন্তরে তাদের অভিনিবেশ নিবদ্ধ হল।

'তরঙ্গভঙ্গে'র যে কাহিনী, তার কাঠামো অবশ্যই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। নাট্যকারও যেন একটা সমাজ-বক্তব্য প্রকাশে উন্মুখ। নেওলাপুরী ও বারিশপীর---তাদের স্বস্ব শ্রেণী চরিত্র নিয়ে উপস্থিত। শ্রেণীসত্তার তীক্ষ্ণ সম্পর্কগুলো নাট্যকার নগ্নভাবে উন্মোচিত করেছেন। জনতা, উকিল, গ্রামবাসী—সব চরিত্রগুলো সেই যুক্তিসঙ্গত কাঠামোর এক একটি অঙ্গস্বরূপ। এমন কি যে ঐতিহ্যকে প্রাসঙ্গিক ভেবে জীবনের আশ্রয় খোঁজা হয় তারও উপস্থিতি নাটকে বর্তমান, যেমন আখতারী বিবির কেচ্ছা। এমনকি ভিখারিণীও অবাস্তব নয়। প্রতীকী তাৎপর্য সত্ত্বেও সে নির্মোহ উলঙ্গ সত্যের প্রকাশক।

কিন্তু এতোসব বস্তুভিত্তি ও সম্পর্কসূত্র নাট্যকার তুলে ধরেও অভিব্যক্তিবাদী ভঙ্গিমার জন্য সেটা ভিন্নতর সংজ্ঞায় উত্তীর্ণ হয়। বস্তুতঃ যে রীতি তিনি গ্রহণ করেছেন সেটা সমাজ-বক্তব্য প্রকাশের জন্য প্রাসঙ্গিক নয়, অনিবার্য নয়। তাছাড়া কেবল বস্তুবোধে আশ্রিত হলেই হয় না, মানুষের বর্তমান অবস্থান ও অনন্ত ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রত্যয় ও সচেতনতাই শিল্পীকে বক্তব্যবিষয়ে স্থিত করে; প্রাজ্ঞ করে। কিন্তু অভিব্যক্তি-বাদীরা একধরনের সমাজসচেতন হলেও তা ছিলো ব্যক্তিগত ভাববাদের কোলে আশ্রিত।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র চেতনায় এই উভয়ের জটিল সম্পর্ক তাঁর নাট্যচেতনায় এভাবেই ধরা দিয়েছে। তবে এই ভাববাদ আবেগগত নয় বরং মনন ও বুদ্ধিনির্ভর। নাট্যকারের মানসিকতার মূলসূত্র এখানে উল্লিখিত রীতিটির সঙ্গে যতটা জড়িত, বক্তব্যের দিকে ততটা নয়। এক্সপ্রেসনিজমের অস্তিত্ববাদী চিন্তা-বৈশিষ্ট্য দ্বারা এখানে তিনি আক্রান্ত। যদিও বাহ্যতঃ মনে হয় সমাজ-বাস্তবতার কাঠামোকে তিনি ধরতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু নাট্যকারের প্রকৃত প্রবণতা সমাজ বাস্তবতাকে বস্তুগতভাবে আঁকা নয়, বরং বস্তুটিকে অন্যভাবে প্রকাশের জন্য ভিন্ন উপায়ের অনুসন্ধান। বস্তুতঃ সে সন্ধান থেকেই অভিব্যক্তি-বাদের জন্ম হয়েছিল। প্রচলিত জীবনে যেমন অনাস্থা, প্রচলিত রীতির উপরেও অশ্রদ্ধা-বশতঃ নতুন প্রকাশকে অবলম্বন করতে হয়েছে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ জজসাহেবের বিষণ্ণতা, একাকিত্ব ও ব্যর্থতার ভাবনির্যাসকে প্রকাশ-রূপ দিতে বেশী উৎসুক। আমেনার সামাজিক নির্যাতনের কারণ আবিষ্কারে ও তার প্রতিরোধে ততটা নয়। এজন্য নাটকটির চরিত্রাবলী ও প্লট বাস্তবের সঙ্গে আকৃতিগত সাদৃশ্য রেখেছে বটে, কিন্তু সবই এক চরম ঔদাসীন্যে রহস্যাবৃত—এমনকি নেওলাপুরীও। ভীতি যাকে পরিণামে অধিগত করে। তারা সবাই প্রচলিত রূপের বদলে হয়ে যায় অন্যতর, তাদের অন্তর্গতা বাইরের দেখা রূপের চেয়ে একেবারেই পৃথক ও বিপরীত শেষদৃশ্যের ভিখারিণী, জজ, নেওলাপুরী, যুবক—প্রতিটি চরিত্রই তাই স্বপ্নদৃশ্য থেকে ভিন্নরূপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। স্বয়ং নাট্যকার তাদের এই পার্থক্যকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে দিয়েছেন এবং তারতম্য নির্দেশ করেছেন। দৃশ্যপট, চরিত্র সবই এক, কিন্তু বস্তু ও অন্তর্বস্তুর মধ্যে যে পার্থক্য তার উল্লেখ সচেতনভাবেই করা হয়েছে। যেমন—"বেশভূষা, আসবাবপত্র, কাঠগড়া, জজের মঞ্চ—সবই ঠিক তেমনি। জজ, উকিল, কেরাণী, পুলিশ, মৌলবী আবদুস সাত্তার এবং শ্রোতাগণ প্রথম অঙ্কে যেখানে যে-ভাবে বসে বা দাঁড়িয়েছিলো এই অঙ্কেও তেমনি বসে বা দাঁড়িয়ে। আসামী আমেনাও যথাস্থানে আবছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে এবং পূর্বের মতই মূঢ় মানুষের ভাবশূন্য নিথরতায় সে স্থির-নিশ্চল। তবে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে প্রথম অঙ্কের দৃশ্য এবং এ-অঙ্কের দৃশ্যের মধ্যে নানাবিধ প্রভেদ-তারতম্য পরিলক্ষিত হবে।"[৭]

নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে উপস্থিত চরিত্রগুলো অন্তর্সত্তার প্রকাশক। তারা সেখানে অচেনা চেহারায় প্রতিভাত। অভিব্যক্তিবাদীদের প্রত্যাশাই ছিল তাই। নিরেট, স্থূল, বস্তুতন্ত্রতার দিক থেকে গতি পরিবর্তন করে এক বৃহত্তর, মুক্ততর প্রকাশের দিকে অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতেন তারা। সেই অগ্রসর-যাত্রায় বিষণ্ণতা ও একাকিত্বের নির্যাস, বিচিত্র বিন্যাসে চূর্ণ হয়ে যাওয়া ব্যক্তির বিভঙ্গ রূপ আঁকাই তাদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল।

নাটকটি পাঠের পর আমাদেরও মনে হয়, নাট্যকার চরিত্র, পরিবেশ, ঘটনার কাঠামো—সব ব্যবহার করেও বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস থেকে মুক্ত থেকেছেন বা একরকম ঔদাসীন্যে নিমগ্ন থেকেছেন। তাই স্বপ্নদৃশ্য এ নাটকের প্রকৃত ঘটনা, এখানে যা ঘটেছে তাই আসলে বাস্তব। আমরা শেষদৃশ্যে যা দেখছি তা অর্ধবাস্তব, অর্ধসত্য। ঐ অর্ধবাস্তব ও অর্ধসত্যের জগতে আমরা বাস করি, প্রকৃত ও পূর্ণ সত্য তা থেকে বহুদূরে।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে নাটকটিতে মূর্ত ও অমূর্ত—উভয়ধারার সমন্বয় ঘটেছে। এতে বিষয়বস্তুতে মূল্য আরোপ করা হয়েছে, বাস্তবের সীমা ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বে ও দূরে চলে এসে বিষয়ের কেবলমাত্র ভাবসত্তাকে প্রকাশ করেছে। এর ফলে মনে হওয়া স্বাভাবিক, অভি-ব্যক্তিবাদীরা ঠিক বিমূর্তবাদী নয়। তারা একটা রূপ অবশ্যই দেয়, যদিও সে রূপটা

প্রচলিত রূপের উল্টো ও ঘোরানো কোন রূপ। আমেনার হত্যাপরাধের ঘটনার অন্তরালবর্তী স্বরূপই তুলে ধরা হয়েছে। হত্যাকারী আমেনা নয়, হত্যাকারী আবদুস সাত্তার নেওলাপুরী। কিন্তু তার চেয়ে বড় হত্যাকারী হচ্ছে সেই আদিম প্ররোচনা—যে প্ররোচনা মানুষকে হননক্রিয়ায় উদ্বোধিত করে। বাস্তবরূপকে যখন অস্বীকার করে' মনোগতরূপের এই ব্যবধানকে তুলে ধরা হয়, তখন নাটকে প্রায়শঃ গৃহীত হয় মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি। এই পদ্ধতির আওতায় মনোস্তরের সবগুলি ধাপ বিশ্লেষণ করা হয়। 'তরঙ্গভঙ্গে'র মতলুব আলী সেই মনোস্তরের প্রতীকীতাৎপর্য বহন করছে।

সে রহস্যময় ছায়াচ্ছন্ন প্রবৃত্তির প্রতীক, তার সামাজিক পরিচয় একজন ব্যর্থ কন্ট্রাক্টর, যার বিলগুলো পাশ হয়নি। কিন্তু চরিত্রটির দ্বিতীয় অস্তিত্ব হচ্ছে স্বাধীন, নিরপেক্ষ, পরিবেশ-নিষ্ক্রিয় এক মৌলবোধ, যা মানুষকে সর্বদা আত্মহননে জিঘাংসায় প্ররোচিত করে। নাটকের দীর্ঘ বর্ণনায় সেই প্ররোচনার উলঙ্গ প্রকাশ—

"মতলুব আলী—(স্মৃতি-ভরা কণ্ঠে) একদিন আমি ছায়াশূন্য ছিলাম। মনে হয় বহুদিন আগে, তারপর সেই ছায়া এলো হঠাৎ। শূন্যমাঠে ঘূর্ণি-ওঠার মত প্রথমে আমার আশে-পাশে ঘোরে। সাহস নেই যে ঝট করে আমাকে ছোঁয়। তখন আমার যেমন তাকে ভয়, তারও তেমনি আমাকে ভয়। তারপর একদিন আমার হার হলো। যেদিন সে আমার ভেতর প্রবেশ করলো, সেদিন অদ্ভুত একটা তৃপ্তি পেলাম। কখনো-কখনো ভাবি, কে কাকে গ্রহণ করেছে? সে বীভৎস-ছায়া আমাকে গ্রহণ করেনি, আমিই তাকে গ্রহণ করেছি। জজসাহেব, বগলে বিল নিয়ে যে ঘাটে-বাটে পাগলের মতো ঘুরাঘুরি করি, সে-টা আমার বাইরের চেহারা। সেটা সমাজে বাস করার ছাড়পত্র শুধু। কিন্তু ভেতরের চেহারা ভিন্ন।"[৮]

"...সে যখন কারো ভেতরে প্রবেশ করে তখন তা বুঝতে বিন্দুমাত্র দেরী হয় না। তখন হঠাৎ আকাশের নীলিমা রং বদলায়, সবুজ গাছপালা বর্ণহীন হয় আর সারা দুনিয়া ধূধূ প্রান্তরে পরিণত হয়।"[৯]

নাট্যকার তার অনবদ্য গদ্যে উত্থাপিত করেন সেই প্ররোচনার প্রভাবে আমেনার হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা—"উঠানে বসে আছে আমেনা, বাঁশের ডগায় বসে কাক ডাকছে, ছেলে-মেয়েগুলো পা ছড়িয়ে বসে ট্যা-ট্যা করছে। হঠাৎ বেড়ার ফাঁক দিয়ে একটি লোক এগিয়ে এলো, এত আলগোছে যেন হাওয়ায় পা ফেলে এলো। গায়ে ধবধবে আলখাল্লা। এধার-ওধার চেয়ে আমেনার কাছে সে বসে পড়লো পায়ের গোড়ালীতে ভর দিয়ে। তারপর সে কানে-কানে বললো, আমেনা, এসো আমেনা, আমি যা বলি তাই করো। শুনেছ? এসো অন্ততঃ একটা সমস্যার সমাধান করি। পরপর সব দৃশ্য ভেসে উঠছে চোখের সামনে। ঐ পুকুরের ধার দিয়ে, করিমউদ্দিনের ক্ষেতের পাশ দিয়ে দ্রুত-পদে চলছে আমেনা, বুকে তার অবোধ শিশু। তারপর সেই জঙ্গলের নিদারুণ দৃশ্য। সব সময়েই পায়ে-পায়ে আছে সে-লোকটি পরনে তার সাদা আলখাল্লা।"[১০] এই বর্ণনার পাশাপাশি ভিখারিণীর বাস্তবসত্য প্রকাশের ভাষা পুরো ঘটনাটির ভেতর ও বাইরের চেহারাকে মূর্ত করে তুলেছে। পূর্ণাঙ্গ করেছে বৃত্তটিকে। অন্তর্বস্তু ও বহির্বস্তু সমভাবে প্রকাশিত হয়েছে—"মানুষ তখনই নিজের সন্তানের প্রাণ নেয় যখন এ-দুনিয়ায় তার আর কোন নালিশ-অভিযোগ নেই, বিচারেরও আশা নেই, এ-মেয়েলোক তার শেষ কান্না কেঁদেছে, শেষ কথাও বলেছে। কোলে মৃত সন্তান, শেষবারের মত একবার কেঁদে বিজলী ঝলসানো মানুষের মত সে বসে আছে,"[১১]

'তরঙ্গভঙ্গ' কি এ্যাবসার্ড বা অসম্ভব নাটক? দ্বিতীয় দৃশ্যটি অসম্ভব নাটকের লক্ষণ।

অভিব্যক্তিবাদের এক গভীর ও অন্তর্মুখীন রূপই এ্যাবসার্ড নাটকে ধরা দিয়েছে। পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব বিভ্রান্ত এবং যন্ত্রণাদগ্ধ। এই যন্ত্রণাদগ্ধ অস্তিত্বকে বিস্মৃত হয়ে কোন কল্পিত আনন্দের জগৎ সৃষ্টি করা অনুচিত কর্ম। আবার কল্পিত জগৎ-ও যে অন্তঃসারশূন্য ও ভ্রান্ত তাও প্রতিপন্ন হয়ে গেছে। অতএব, সেই কল্পিত আনন্দের সঙ্গে তুলনা করলে এই বর্তমান পৃথিবীতে অবস্থানটাই হচ্ছে অসম্ভব একটি ঘটনা। এই চিন্তার যে নাট্যরূপ পৃথিবীকে আলোড়িত, ভাবিত করেছে—সেই অসম্ভব নাটকগুলো থেকে 'তরঙ্গভঙ্গ' অনেকটাই পৃথক।

আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মচিন্তা যা অনেক নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর রূপ ফুটিয়ে তোলে, যে সত্যকে আমরা এড়িয়ে যাই বা মার্জিত রূপে উপস্থাপিত করি ; তাকে স্পষ্টভাবে এ্যাবসার্ড নাটক তুলে ধরে। সেই হাস্যকর উপস্থাপনাকে ব্যঙ্গ করে। সেদিক থেকে জজের আত্ম-তদন্ত ও আত্মবিশ্লেষণ, জনতার ভয়ঙ্কর উন্মত্ততা ও নিষ্ঠুরতা এ নাটকে রয়েছে। কিন্তু এ্যাবসার্ডের মূল যে বৈশিষ্ট্য মানসিক অসঙ্গতি ও অস্তিত্বহীনতা, এ নাটকে তা অনুপস্থিত। বরং অস্তিত্বের সংকট ও নিরীক্ষাই এখানে সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

তাই অবচেতনের দৃশ্যেও আছে যুক্তিবশ্যতা। কোথাও পারম্পর্যহীন, অর্থহীন সংলাপ নেই। চরিত্রের সংলাপগুলো যুক্তিবোধে সুগ্রন্থিত, যে গ্রন্থণা আরও দৃঢ়তর হয় জজের বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে নেওলাপুরী ও বারিশপীর যখন শ্রেণীসখ্যতায় পরস্পর আবদ্ধ হয়। কিন্তু এ্যাবসার্ড নাটকে সবরকমের সম্পর্কের ভাঙন ও হাস্যকর অবস্থানকে প্রকট করে তোলা হয়, ব্যঙ্গে ভরিয়ে দেওয়া হয়। আবার এ্যাবসার্ড নাটক স্বপ্ন ও বাস্তবের একীকরণ নয় ; কেননা স্বপ্নও একধরনের চিন্তাসমন্বিত প্রকাশ। এ্যাবসার্ড নাটক আরও উৎকট সত্যের দিকে ধাবিত, কাঠামোহীন কাহিনী ও অনির্দেশ্য জীবন ভাবনায় অবসিত। লক্ষ্যহীন সংলাপ এর মূল বৈশিষ্ট্য। 'তরঙ্গভঙ্গ' স্বপ্নও বাস্তব, মূর্ত ও বিমূর্ত—ভাবনায় জড়িয়ে গিয়ে এ্যাবসার্ড-এর প্রান্ত ছুঁয়ে গেলেও রীতিবিন্যাসে ও অন্তর্গত চিন্তাশৈলীতে অভিব্যক্তিবাদী নাটকের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

আলোকের ব্যবহার এই নাটকের অন্যতম শর্ত, চিত্রকলায় যেমন রংয়ের ব্যবহারে এক্সপ্রেসনিস্টিক রীতিটি আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়েছিল। একটিমাত্র স্টেজসেটিং-এর ফলে ভাববস্তু যেহেতু সীমিত ও স্থিররূপ পেয়েছে, সেখানে আলোকের ব্যবহার তরল, স্বচ্ছন্দ গতিময় সঞ্চরণশীলতার সৃষ্টি করেছে। আলোর প্রক্ষেপণ বস্তুর ওপরে রহস্যময়তা আরোপ করে। ফলে মঞ্চে সংঘটিত দৃশ্যাবলী সম্পর্কে দর্শক-হৃদয়ে প্রত্যয় জন্মে। এক ধরনের বিশ্বাস-যোগ্যতা গড়ে ওঠে। এই নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে আলো, রং ও ধ্বনির যথোপযোগী প্রয়োগ নাটকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে। গ্রামবাসীদের শরীরের চাদরের রংয়ের ভিন্নতা যেমন তাৎপর্যপূর্ণ, তেমনি রয়েছে ধ্বনির সাংকেতিক প্রয়োগবিধি। কুকুরের ডাক, ঢোলের শব্দ, বৃষ্টির আওয়াজ ইত্যাদি ধ্বনিব্যঞ্জনা এখানে কখনও নিরর্থক নয়, মূলঘটনার সঙ্গে গভীরভাবে সংলগ্ন। সাংকেতিক দ্যোতনা ও প্রতীকের ব্যবহারকে এক্সপ্রেসনিস্টরা গ্রহণ করেছিল তাদের ভিন্ন প্রকাশরীতির ঐতিহাসিক প্রয়াসের ক্ষেত্রে। এবং সেগুলোকে মুখ্য ভূমিকাও দিয়েছিল। এমনকি এই সাংকেতিকতা লক্ষণীয় ভাষাবোধের জগতেও। এখানে টেলিগ্রাফিক তারের মতো ধ্বনিসংকেতময় পৃথক অর্থবাহী ভাষা যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে কাব্যগন্ধী ম্যাটাফিজিকাল ভাষাও। যেমন—

"ভিখারিণী।—(অন্ধকার থেকে ঢোলের আওয়াজ থামলে) লড়াই লেগেছে গো ; বিষম লড়াই লেগেছে। দুর্বল যারা, কোমলচিত্ত যারা, কাপুরুষ যারা তারা আপন আপন জান বাঁচাও, আপন আপন বিষয়বস্তু রক্ষা করো।" ১২

"প্রথমকণ্ঠ। আলোকে যার ঘৃণা, ফাঁসিতে তার ভয় নেই। কে তাকে ভয় দেখাতে পারে ?

জনতা। (সমবেত কণ্ঠে) কেউ ভয় দেখাতে পারে না।
প্রথম কণ্ঠ। কে তাঁকে ছুঁতে পারে ?
জনতা। (সমবেত কণ্ঠে) কেউ ছুঁতে পারে না।" [১৩]

সমগ্র নাটকজুড়ে বস্তু ও নির্বস্তুক ভাবের আলোছায়া দুলে উঠেছে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র সংলাপ নির্মাণে সেই দোলা জেগেছে চরিত্রের অন্তর্সত্তার যে অভিব্যক্তি তার অভ্যন্তর থেকে। জীবনের কাঠামোর ভেতরে তাঁর অন্তর্নিবিষ্ট দৃষ্টি খুঁজে ফিরেছে এক উলঙ্গ সত্যকে ; প্রকট বাস্তবতাকে। যে বাস্তবে বাস করি সে বাস্তব অর্থহীন, নিরেট শূন্যতায় এবং নিষ্ক্রিয়তায় ফাঁপা, শেষদৃশ্যে তাই জজসাহেব কোন রায় দিতে পারেননি। বিচারের ভার কালের হাতে তুলে দেওয়া হল।

তথ্যনির্দেশ

১ "তরঙ্গভঙ্গ" প্রথমে 'একটি বিচারকের কাহিনী' নামে ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র 'সংলাপে' প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৬৪ সালে।
২ পত্রাবলীর অংশবিশেষ। দ্র. "সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র জীবন ও সাহিত্য", সৈয়দ আবুল মকসুদ, ১ম প্রকাশ ১৩৮৮, পৃ. ৩৩৯
৩ তরঙ্গভঙ্গ পৃ. ৩৭
৪ ঐ, পৃ. ৫৭
৫ ঐ, পৃ. ৮০
৬ ঐ, পৃ. ৭৯
৭ ঐ, পৃ. ৮১
৮ ঐ, পৃ. ৩০
৯ ঐ, পৃ. ৩৪-৩৫
১০ ঐ, পৃ. ৩৯
১১ ঐ, পৃ. ৩৮
১২ ঐ, পৃ. ৬৪
১৩ ঐ, পৃ. ৫৭

গ্রন্থপঞ্জী

১ তরঙ্গভঙ্গ ; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, ২য় প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৩৭৫
২ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র জীবন ও সাহিত্য : সৈয়দ আবুল মকসুদ, ১ম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৮১
৩ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক—ড. গীতা সেনগুপ্ত, ১ম প্রকাশ ১৯৭৫